Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ছাত্রসমাজের অবক্ষয় দূরীকরণে শিক্ষক ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফেরদৌস আরা

রোলঃ ২১৫০০১১৪৪

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ছাত্রসমাজের অবক্ষয় দূরীকরণে শিক্ষক ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফেরদৌস আরা
রোলঃ ২১৫০০১১৪৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ছাত্রসমাজের অবক্ষয় দূরীকরণে শিক্ষক ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফেরদৌস আরা, আইডিঃ ২১৫০০১১৪৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ছাত্রসমাজের অবক্ষয় দূরীকরণে শিক্ষক ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাফেজ মাওলানা মোঃ শারাফাত করীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

ফেরদৌস আরা

আইডিঃ ২১৫০০১১৪৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সারসংক্ষেপ	৫
১) ভূমিকা	৬
২) শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান করুণ অবস্থা	৭
২.১) ছাত্রসমাজের অবস্থা	৭
২.২) শিক্ষকসমাজের অবস্থা	১০
২.৩) শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা	১২
৩) ইসলামের স্বর্ণযুগে শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা	১৩
৩.১) ছাত্রসমাজের অবস্থা	১৪
৩.২) শিক্ষকসমাজের অবস্থা	১৫
৩.৩) শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা	২১
৪) ইসলামী শিক্ষার আলোকে শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান অবস্থা উত্তরণের উপায়	২২
৪.১) শিক্ষা দর্শন	২২
৪.২) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন	২২
৪.৩) শিক্ষক প্রশিক্ষণ	২৪
৪.৪) জনমত গঠন	২৬
৪.৫) মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন	২৬
৪.৬) শিক্ষাব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ও হালনাগাদকরণ	২৭
৫) উপসংহার	২৭
গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র	২৮

সারসংক্ষেপ

একটি উন্নত দেশ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার হলো ছাত্রসমাজ। আর এই হাতিয়ার গড়ার কারখানা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার কারিগর হলেন শিক্ষকগণ। এই তিন চাকায় ভর করে একটি জাতি অগস্রর হতে পারে সুদক্ষ জাতির অগ্রযাত্রায়। এই তিন চাকার যেকোন একটি যখন অচল হয়ে পড়ে, তখন পুরো দেশ ও জাতি পিছলে পড়ে অজ্ঞানতা আর অবনতির ভ্রষ্ট পথে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ পুরো দেশ জুড়ে যে অবক্ষয়ের ঘুণ ধরেছে, তা আমাদের ছাত্র সমাজেও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি, ধর্মীয় মুল্যবোধের অবমাননা, ঘরে ঘরে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের ছন্দপতন দিন দিন দেশের ছাত্রসমাজকে অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। এই অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হলে ছাত্রসমাজকে এককভাবে দায়ী করলে চলবে না, বরং শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকসমাজকে ছাত্রসমাজের সাথে একযোগে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা এই অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে – এ কথা দিবালোকের মত পরিষ্কার। পক্ষান্তরে আমরা যদি ১৪০০ বছর আগের ইসলামি সমাজব্যবস্থার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে ততকালীন যুগে ছাত্রসমাজ, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকসমাজ - এই তিনটি সত্ত্বার সমন্বিত প্রয়াসের ফলে এক অভূতপূর্ব সমাজ ব্যবস্থা বিরাজ করেছিল, যার তুলনা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন। আর এটাই স্বাভাবিক, কারণ ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সত্য ধর্ম ও সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রদর্শিত একমাত্র পথ। আমি এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অংশে বর্ণনা করব আমাদের ছাত্রসমাজ, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকসমাজের বর্তমান চিত্র। দ্বিতীয় অংশে আমি আলোকপাত করব ইসলামের স্বর্ণযুগের শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা। তৃতীয় অংশে আমি উপস্থাপন করব যে কিভাবে বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থায় উজ্জীবিত হয়ে বর্তমানের ঘূণে ধরা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে, ছাত্রসমাজকে অবক্ষয়ের পথ হতে ফেরাতে পারে ও দেশ ও জাতিকে অজ্ঞানতার জরা থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ্ই একমাত্র তাফীকদাতা।

১) ভূমিকা

সকল প্রশংসা জগতসমূহের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর)। শেষ ভাল পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল।

মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান

ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল!

আমরা ছাত্রদল॥

....

মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।

আমরা ছাত্রদল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর "ছাত্রদলের গান"[1] কবিতায় যথার্থই তুলে ধরেছেন ছাত্র সমাজের পরিচয় ও তাদের প্রতি দেশ ও সমাজের আশা-আকাঙ্খার কথা। একটি দেশের জমি যত উর্বর হয়, সেখানে ফল-ফলাদি জন্মানোর সম্ভবনাও বেশি থাকে। তেমনি একটি দেশের ছাত্রসমাজ যত দক্ষ ও সুগঠিত হবে, সেই দেশ উন্নয়নের দিকে ততটাই অগ্রসর হবে। কারণ, ছাত্ররাই ভবিষ্যত প্রজন্ম। আজকের ছাত্রই হবে ভবিষ্যতের শিক্ষক, ডাক্তার কিংবা প্রকৌশলী, হবে একটি উন্নত সমাজ, জাতি, পরিবারের সংগঠক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের ছাত্র সমাজ আজ অবক্ষয়ের ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ছাত্রসমাজ তথা পুরো যুবসমাজ আজ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই সাথে দেশ ও জাতি হারিয়ে যাচ্ছে হতাশা আর অজ্ঞানতার আঁধারে। কোনো সমাজ কিংবা জাতির জন্য এটা

কাম্য হতে পারে না। তাই দেশ, জাতি ও সমাজ রক্ষার্থে ছাত্রদের এই অবক্ষয় রুখে দাড়াতে হবে। আর এর জন্য এগিয়ে আসতে হবে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রত্যেককে। তবেই গঠিত হবে সুষ্ঠু ছাত্র সমাজ, গড়ে উঠবে সম্ভাবনার নতুন জাতি।

সৃষ্টির শুরু থেকে তথা আদম (আঃ) থেকেই শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল, সেটি প্রাতিষ্ঠানিক হোক বা না হোক। আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সভ্যতায় শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সভ্যতা তথা দেশে বিভিন্ন রকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ও বর্তমানে আছে। আমরা যদি একটি শিক্ষাব্যবস্থার অংশীজন (stakeholder) দের কথা চিন্তা করি, তারা হলেনঃ শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালক, এবং সরকার-সমাজের সুধীজন। একটি শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী ও উপকারী হতে হলে এদের সবার ভূমিকা আছে। এই অভিসন্দর্ভে আমি বিশেষভাবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

২) শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান করুণ অবস্থা

এই অংশে আমি আলোচনা করব বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থার হতদরিদ্র অবস্থা। ছাত্রসমাজ, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -- এই তিনটি মাত্রায় আলোচনা করা হবে।

২.১) ছাত্রসমাজের অবস্থা

জীবনে সৎ, সুন্দর, কল্যাণকর ও শান্তির মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হলে কিছু গুণের প্রয়োজন হয়। সাধারণত এসব গুণকে বলা হয় মূল্যবোধ বা নৈতিকতা। সামাজিক ও ধর্মীয় এসব মূল্যবোধ যুবসমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু বর্তমান সমাজে এ সকল মূল্যবোধের অনুশীলন ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে যুবসমাজ বিপথগামী হয়ে ধ্বংসের দারপ্রান্তে পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য, যেমনঃ ২০১৩ সালের অগাষ্ট মাসে, ও-লেভেলের ছাত্রী ঐশি রহমানের

পরিকল্পনায় বাবা মা দুইজনকে খুন[2], ২০২১ সালের ১৫ই মে অতিরিক্ত মাদক সেবনে ঢাবি ছাত্র হাফিজুরের মৃত্যু[3], ২০২৩ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রেমে বাধা দেওয়ায় ঢাকার নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির অনার্সের শিক্ষার্থী কর্তৃক মাকে খুন[4]। কতোটা বিপথগামী হলে আজকের ছাত্রসমাজ এধরনের বীভৎস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে। এছাড়া পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে বাধা দেওয়ায় শিক্ষককে লাঞ্চিত করার ঘটনা গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার সংবাদপত্রে উল্লেখিত হয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের থেকে শ্রদ্ধা পাওয়ার আশা বিসর্জন দিতে বসেছেন।

উচ্চমাধ্যমিক এর পর থেকেই ছাত্র রাজনীতি অনেকাংশে ছাত্রসমাজের অংশ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে গেলেই কম বেশি ছাত্র রাজনীতির অংশ না হবার সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, পছন্দনীয় বিষয় নির্বাচন, হলে সিট পাওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা পেতেই লাগে রাজনৈতিক প্রভাব এর ব্যবহার। বাধ্য হয়ে অনেক মেধাবী ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তাদের মেধার অপব্যবহার করে। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের অসুস্থ রাজনীতিতে প্রান হারাচ্ছে রাজনীতি নিরপেক্ষ অনেক ছাত্র ছাত্রী। বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের মৃত্যু, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি্র এমন মৃত্যুতে পুরো জাতি শোকাহত ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতায় দিনের পর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পরীক্ষা পিছানো, সেশনজট প্রভৃতি কারনে অনেক ছাত্রই পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে অকালে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে।

আমাদের সমাজের অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে লেখাপড়া করতে পারে না। পরিবার ও সরকার হতে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ায় মাঝপথে এদের শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। ফলে তারা শিক্ষার অভাবে নানা কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে বিপথে ধাবিত হয়। অর্থনৈতিক অভাবের কারণে ছাত্রসমাজকে তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা, হত্যা ও অপহরণসহ মাদক ইত্যাদি নানা অপরাধে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

কর্মসংস্থানের যথাযথ সুযোগ ও কর্মমুখী শিক্ষার অভাবে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত তরুণ-তরুণী লেখাপড়া শেষ করার পরও চাকরি পায় না। ফলে নানারকম মানসিক হতাশায় ভোগে, অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। চাকরির অভাবে তারা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দীর্ঘ সময় এই অবস্থা চলতে থাকার ফলে তাদের ভেতরে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ জন্ম নেয়। তারা তদের শিক্ষাকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজে লাগানোর সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনেআমাদের ছাত্রসমাজ আজ নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে বিজাতিদের সংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়েছে ও তাদের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এমনকি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজাতীয় সংস্কৃতিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ছাত্রসমাজ তাদের নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কী – তা ভুলেই গেছে। পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই, আজ তাদের দেশে মানবতা কত অসহায়, নারীরা কত নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। তাদের দেশের অনেক মানুষ তাদের বাবা-মায়ের পরিচয় জানে না। বৃদ্ধ মাতাপিতাদের খোঁজ খবর নেওয়ার মত কেউ নেই। আবার মা-বাবার নিকট তাদের সন্তানেরও কোন হিসেব নেই। ভাই বোনের কোনো পরিচয় নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বন্ধন নেই। মানসিক অশান্তি তাদের নিত্য দিনের সাথী। তাদের জীবন যে কত দূর্বিসহ তা দেখলেই বুঝা যায়। আত্মহত্যা, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এসবের পেছনে বড় ভূমিকা আছে তাদের নৈতিকতা-বিবর্জিত ও শুধুমাত্র দুনিয়ামুখী বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থার। বিজাতিদের সভ্যতা সংস্কৃতির এই অন্ধ অনুকরনে আজ আমাদের ছাত্রসমাজেও জীবন ধ্বংসকারী এসব চিন্তা-ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ছাত্রসমাজের অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল প্রচার মাধ্যম। প্রচারমাধ্যম নারী-পুরুষের উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ চিত্র ও বিভিন্ন প্রকারের অশালীন দৃশ্য দ্বারা ভরে থাকে। ফলে যুবকরা এ সব দেখে প্রভাবিত হচ্ছে এবং অপকর্মের প্রতি ধাবিত হচ্ছে[৫]। প্রচার মাধ্যমগুলো আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে মুছে দিয়ে পশ্চিমা দুনিয়ার

বিজাতীয় সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে বাস্তবায়ন করতে চায়। বিশেষ করে টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদিতে যুবকরা খারাপ সিনেমা, নাটক, গান-বাজনা ইত্যাদি দেখে ও শুনে এক অজানা গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

হতদরিদ্র দেশ হিসেবে আমাদের অর্ধেক জনগোষ্ঠি দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানরত। এ সমাজে জ্ঞান উপার্জনের চেয়ে অর্থ উপার্জন কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে জ্ঞান পিপাসু ছাত্রসমাজের পরিবর্তে আমাদের ছাত্রসমাজ হয়ে উঠছে অর্থপিপাসু। জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ হারিয়ে ছাত্রসমাজ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, ব্লগিং, অনৈতিক কার্যকলাপকে অর্থবিত্ত অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করছে।

উপরে বর্ণিত নানা জড়তা কাটিয়ে আমাদের ছাত্রসমাজকে আলোর পথে না আনতে পারলে, একটি সুন্দর ও আলোকিত সমাজ এবং সমৃদ্ধ জাতি কখনও গড়া সম্ভব নয়। ছাত্র সমাজকে অবক্ষয় থেকে বাঁচতে হলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি মাদকমুক্ত, অপরাধমুক্ত, নোংরা রাজনীতিমুক্ত, পশ্চিমা সংস্কৃতির নগ্ন ছোবল থেকে মুক্ত একটি নৈতিকতাপূর্ণ আধুনিক সমাজ।

২.২) শিক্ষকসমাজের অবস্থা

শিক্ষকগণ হলেন জাতি গড়ার কারিগর ও জাতির প্রকৃত কর্ণধার। শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের অন্তরের প্রতিভার উন্মেষ ঘটান, আর ছাত্রছাত্রীরা তা কার্যকর করেন।

একজন শিক্ষক একজন ছাত্রের অভিভাবক। শিক্ষক যে শুধু মাত্র পড়াশোনার ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করে এমনটি নয়, বরং একজন সফল শিক্ষক একজন ছাত্রকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন তিনি ছাত্রদের মনের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে তুলতে পারেন। একজন ছাত্রের জীবনের লক্ষ্য থেকে শুরু করে জীবনের সফলতার প্রত্যেকটা ধাপে শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। তাই একজন শিক্ষককে হতে হয় নীতি-নৈতিকতার সর্বোচ্চ ধারক-বাহক, জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ।

একটি শিশু যখন নিজস্ব সত্ত্বা ছেড়ে খোলস খুলে গুটিগুটি পায়ে পৃথিবীর চলমান নিয়ম-কানুনের মধ্যে বের হয়, তখন তাদের সত্ত্বার বড় একটা অংশ শিক্ষকের সঙ্গে জুড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা পরিবারের সদস্যদের চাইতে শিক্ষকদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আজ ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক যেনো শুধুমাত্র ক্লাসরুম পর্যন্তই বিরাজমান। এর কারণের মধ্যে রয়েছে সামাজিক অবক্ষয়, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের নানারকম নেতিবাচক ধারণা, শিক্ষকের শিক্ষকতার প্রতি অনীহা ইত্যাদি।

দুঃখজনক হলেও সত্য,আমাদের সমাজে শিক্ষকরা আজ অবহেলিত। শিক্ষকতাকে আগের মত আর একটি সম্মানজনক পেশা হিসাবে গণ্য করা হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। এর কারণগুলো অনুসন্ধান করলে কিছু কারণ বেরিয়ে আসে। প্রথমত, আজকাল অনেক শিক্ষক নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে বস্তুবাদী স্বার্থের পেছনে পড়ে রয়েছেন। ক্লাসরুমে পড়ানোর চাইতে তাঁদের বেশি আগ্রহ দেখা যায় অন্যান্য কাজে, যেমন প্রমোশন, আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি। অনেক শিক্ষক প্রচলিত রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। দ্বিতীয়ত, বিগত ৩০-৪০ বছরের মানবসভ্যতা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, পুরো বিশ্বেই বস্তুবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, আর বিপরীতে নীতি-নৈতিকতার অবনমন ঘটেছে। সমাজ এখন আর আগের মত নীতি-নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেয় না, বরং আর্থিক ও সামাজিক সচ্ছলতাকে অগ্রাধিকার দেয়। তাই বর্তমানে শিক্ষকরা অর্থের পেছনে পড়ে গেছেন তাঁদের মূল দায়িত্ব তথা শিক্ষাদানকে অবহেলা করে। একদিকে রাজনৈতিক কারণে মেধার অবমাননা ও মানসম্মত বেতনের অভাবে মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষকতাপেশায় আসতে অনীহা প্রকাশ করছেন, অপরদিকে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অদক্ষ লোকেরা শিক্ষকতা পেশাতে ঢুকে পড়ছেন। ফলে ছাত্রসমাজ সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমানে শিক্ষকরা একদিকে যেমন নীতি-নৈতিকতার অভাবে ভুগছেন, অপরদিকে সমাজে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা না পাওয়ার কারণে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার কাজে আত্মনিয়োগ করার কাজে অনাগ্রহ প্রদর্শন করছেন। তাঁরা প্রায় সময় হীনমন্যতায়

ভুগছেন। এসব কারণে তাঁদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে। আর এতে সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে ছাত্রসমাজের।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষকদের জন্য যথাযথ সম্মান ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করলে তাঁরা শিক্ষকতাকে শুধু পেশা হিসাবে নয়, বরং ভালোবাসার কাজ হিসাবে গ্রহণ করবে। আর এভাবে গড়ে উঠবে ছাত্র-শিক্ষকের পুত্র-কন্যা তুল্য সম্পর্ক।

২.৩) শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা

প্রথমেই বলা যাক শিক্ষাক্রমের কথা। বর্তমানে আমাদের শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ বস্তুবাদী শিক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ। ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা খুবই নগণ্য, আর যা আছে, তাও গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। এমনকি বস্তুবাদী উপকারী শিক্ষাও যথাযথভাবে দেয়া হয় না। ফলে একদিকে আমাদের ছাত্রসমাজ যেমন নীতি-নৈতিকতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপরদিকে তাদের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে যারা যুক্ত আছেন, অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রচার ও প্রসার তাদের উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য থাকে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও সমাজসেবক হিসাবে প্রচার পাওয়া। ফলে তাদের পরিচালনার দ্বারা ছাত্রসমাজ মোটেই উপকৃত হয় না, দেশের কল্যাণ তো দূরের কথা।

শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দায়িত্ব যাদের, অর্থাৎ দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তাদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে উপযুক্ত শিক্ষাবিদের অভাব রয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা হল, তাদের উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেশ ও জাতির কল্যাণমুখী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা নয়, বরং উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের পছন্দমত ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তদনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা। আর এই অবস্থা আরও খারাপ হয় যখন এই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ধর্মবিমুখ মানুষদের দ্বারা পরিচালিত হয়, কারণ সেক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি পদে পদে পাশ্চাত্যমুখী বস্তুবাদী শিক্ষার পদাচরণ ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অব্যবস্থাপনা ও বিশৃংখলা অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের হতাশার পথে পরিচালিত করে। ভর্তির সমস্যা, পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া, ফল প্রকাশের বিলম্ব, সেশনজট এবং যখন তখন ধর্মঘট ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠানে বোমাবাজি, ককটেলবাজি এবং মারামারি লেগেই থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সব সময় ভয়-ভীতি কাজ করে। আবার কখনও দেখা যায় যে, গুটিকয়েক ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী পুরো ছাত্রসমাজকে জিম্মি করে রাখে।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাতে গোনা কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপ্রাণ চেষ্টা করছে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে একটি ধর্মভিত্তিক ও নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার করতে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে তাঁদেরকে প্রশাসনের রোষানলে পড়তে হয়, যার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো কাংখিত মানে পৌঁছতে পারছে না।

উপরোক্ত অবস্থার কারণে আজ সমাজের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগের মত আগ্রহ নেই। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এই সমাজকে কাংখিত ফলাফল উপহার দিতে পারছে না। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার।

৩) ইসলামের স্বর্ণযুগে শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা

এই অংশে আমরা দেখব ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কেমন ছিল। এখানে আমার উদ্দেশ্য হল বর্তমান অবস্থার সাথে সেই স্বর্ণযুগের অবস্থার তুলনা করা ও তদনুযায়ী কর্মপন্থা ও করণীয় নির্ধারণ করা।

ইসলামি স্বর্ণযুগে ইসলামের ইতিহাসে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার সময়কালকে বোঝায়। যা ৬২২ সালে মদিনায় প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি শক্তির উত্থানের সময় থেকে শুরু হয়। ১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের দ্বারা বাগদাদ অবরোধের সময়কে এর শেষ ধরা হয়[৬]।

৩.১) ছাত্রসমাজের অবস্থা

ইসলামে নবী-রাসুলদের সম্মান সবার ওপর। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, নবীগণ মানবতার শিক্ষক। তারা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার বিধান সম্পর্কে অবগত করেন, ভালো ও মানবতার বিষয়গুলোর শিক্ষা দান করেন। নবী-রাসুলদের পর মা-বাবাকে সব থেকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়। বাবা-মায়ের পর একজন শিক্ষককেও সম্মান দেওয়া উচিত।

বিখ্যাত সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ফকীহ সাহাবিদের মধ্যে সব থেকে গ্রহণযোগ্য ছিলেন, তিনি কোরআন ও হাদিসের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কোরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিবেচনা করা হয় তাকে। এতো উচ্চমাপের ব্যক্তি হওয়ার পরেও তিনি এতোটা সরল ছিলেন যে, হজরত জায়েদ বিন হারেসা আনসারী রা. এর উটের লাগাম নিজ হাতে ধরতেন, এবং বলতেন, আমাদেরকে বিজ্ঞজনদের সাথে এমন আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৭]

বর্ণিত আছে, ইমাম আহমদ রহ. ইসলামী জ্ঞান, তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির দিক দিয়ে তার শিক্ষকের তুলনায় অনেক অগ্রগামী ছিলেন, এরপরেও তিনি কখনো তার শিক্ষকের সামনে বসতেন না, বরং বলতেন, আমাদের শিক্ষকের সামনাসামনি বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি।[৮]

ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম মালিক রহ.-এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন ইমাম মালেক রহ.-এর সামনে কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টাতাম, তখন অনেক ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে উল্টাতাম, খেয়াল রাখতাম যেন তিনি শব্দ পেয়ে কোনওভাবে বিরক্ত না হন।[৯]

পবিত্র কোরআনেই হজরত মুসা আ. ও হজরত খিজির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত মুসা আ. একজন নবী হওয়ার পরও খিজির আ. এর সব কথা ও আদেশ ধৈর্যসহকারে শুনেছিলেন, এ ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

৩.২) শিক্ষকসমাজের অবস্থা

একটি সভ্য ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে মানব জাতির শিক্ষকরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করেন। প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবীই ছিলেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত এবং সু-শিক্ষার ধারক ও বাহক। মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সে ধারার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম প্রেরিত পুরুষ। তার মাধ্যমে ঐশী শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি তার কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে আরবের মূর্খ ও বর্বর একটি জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান এবং ইসলামের মহান বার্তা ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

হযরত রাসূল (সা.) সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কোরআন কারিমে বলেন, 'তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা। যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন, তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা। যদিও ইতোপূর্বে তারা ভ্রান্তিতে (অজ্ঞতায়) মগ্ন ছিলো। ' -সূরা জুমুআঃ০২

রাসূল (সা.) বলেন, "নিশ্চয় আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"[১০]

রাসুল (সা.) যেমন ছিলেন অসাধারন জ্ঞানের অধিকারী তেমনি ছিলেন জ্ঞান বিতরনে অপরুপ ক্ষমতার অধিকারী । হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, 'তার জন্য আমার বাবা ও মা উৎসর্গিত হোক। আমি তার পূর্বে ও পরে তার চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো কঠোরতা করেননি, কখনো প্রহার করেননি, কখনো গালমন্দ করেননি। '[১১]

রাসূল (সা.) বলেন, 'আমাকে আমার প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আমাকে তিনি সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আমার প্রভু আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন সুতরাং তিনি সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা রাসূল (সা.) কে দিয়েছেন সর্বোত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার যাতে সর্বকালের মানুষের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পরিলক্ষিত হন ।

তাই একজন সফল শিক্ষক হতে হলে আমাদের অবশ্যই এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাপদ্ধতির কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া শিক্ষা দিতেন না। হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত 'নিশ্চয় বিদায় হজের সময় রাসূল (সা.) তাকে বলেন, মানুষকে চুপ করতে বল। অতপর তিনি বলেন, আমার পর তোমরা কুফরিতে ফিরে যেয়ো না ..।'[১২] অর্থাৎ রাসূল (সা.) অনুসারী হলে আমাদেরও এমন পরিবেশে শিক্ষা দিতে হবে যখন শিক্ষার্থীগণ শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার এবং মনোসংযোগ স্থাপনের সুযোগ পায়।

পাঠদানের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) একটানা কথা বলতেন না বরং থেমে থেমে বলতেন। যাতে হজরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা কী জানো- আজ কোন দিন? ...এটি কোন মাস? ...এটি কী জিলহজ নয়? ...এটি কোন শহর?'[১৩]। প্রতিটি প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকেন এবং সাহাবারা উত্তর দেন আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। শিক্ষকগণ যদি মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠ দান করতেন তাহলে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তা বুঝা সহজ হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জান্নাতের পাঠ দিতেন, তখন তার চেহারাতে আনন্দ ফুটে উঠতো। আর জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারার রঙ বদলে যেতো। যখন কোনো অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে বলতেন, তার চেহারায় রাগ প্রকাশ পেতো এবং কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেতো। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) যখন বক্তব্য দিতেন- তার চোখ লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো। যেনো তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী। '[১৪] এভাবে নিজে উপলব্ধির সাথে পাঠদান করলে শিক্ষার্থী অধিক মনোযোগ সহকারে পাঠ গ্রহণ করে ।

শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষককে অনেক সময় গল্প-ইতিহাস বলতে হয়, অনেক সময় আকার ইঙ্গিতে বর্ননা করতে হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'দোলনায় কথা বলেছে তিনজন। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ...। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি (মুগ্ধ হয়ে) রাসূল (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি আমাকে শিশুদের কাজ সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি তার মুখে আঙুল রাখলেন। এবং তাতে চুমু খেলেন। '[১৫]

রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী মনকে জাগিয়ে তুলতে নানা প্রশ্ন করতেন। তাদের চিন্তা করার সময় দিতেন। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে মুয়াজ! তুমি কী জানো বান্দার নিকট আল্লাহর অধিকার কী? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বলেন, তার ইবাদত করা এবং তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করা। '[১৬]

পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব জানা থাকলে শিক্ষার্থী আগ্রহের সাথে শিক্ষকের আলোচনা শোনে। রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) তাকে বলেন, 'মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে কোরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেবো। তিনি বলেন, আমি যখন বের হওয়ার ইচ্ছে করলাম। রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, তোমাকে বলিনি! মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কোরআনে সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দেবো। অতপর তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। '[১৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে এবং তার ওপর আমল করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন।[১৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের সময় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করাতেন।

রাসূল (সা.) উপমা ও উদাহরনের মাধ্যমে পাঠদান করতেন। হযরত সাহাল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করবো। হযরত সাহাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) তার শাহাদত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন। ’[১৯]

রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার সুযোগ তো দিতেনই এবং প্রশ্নকারীর প্রসংশাও করতেন।কারন প্রশ্ন করার কারনে পাঠটি সকল স্তরের মানুষের বোধগোম্য হতো। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। ‘এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন! কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সড়িয়ে নিবে। রাসূল (সা.) থামলেন এবং তার সাহাবাদের দিকে তাকালেন। অতপর বললেন, তাকে তওফিক দেওয়া হয়েছে বা তাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। ’[২০]

রাসূল (সা.) নিজে আমল করতেন এবং অন্যদেরও আমল করার শিক্ষা দিতেন। সাহাবিদের শেখাতেন। রাসূল (সা.) বলেন, ‘তোমরা নামাজ আদায় কর, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো। ’[২১]

একবার এক যুবক রাসূল (সা.) কে বললো। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা মারমুখি হয়ে উঠলো এবং তিরস্কার করলো। রাসূল (সা.) তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি কী তোমার মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ কর? সে বললো, আল্লাহর শপথ না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। রাসূল (সা.) বললেন, কেউ তার মায়ের ব্যাপারে এমন পছন্দ করে না। এরপর রাসূল (সা.) একে একে তার সব নিকট নারী আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সে না উত্তর দেয়। এভাবে রাসূল (সা.) তার বিবেক জাগ্রত করে তোলেন।[২২] এভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি নিষেধ না করে প্রশ্নকারীর বিবেককে জাগিয়ে তুলতেন যাতে সে নিজেই ভালোমন্দ বিচার করতে পারে এবং মন থেকে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

কখনো কখনো পাঠদানের সাথে সাথে রাসুল (সা.) ছবি একে বোঝাতেন। হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূল (সা.) একটি চারকোণা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন। যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা। ’[২৩]

পাঠ আয়ত্বে রাখতে রাসূলে (সা.) শিক্ষার্থীদের বার বার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে মনে রাখার আদেশ দিতেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, ‘তোমরা কোরআনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে। ’[২৪]

রাসূল (সা.) স্বাধীন আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ দিতেন। যেমন, হুনায়নের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নিয়ে আনসার সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে রাসূল (সা.) তাদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন। একইভাবে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।[২৫]

গুরুত্বপূর্ণ পাঠে একাগ্রতা আনতে রাসূল (সা.) তিন বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূল (সা.) তার কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেনো তা ভালোভাবে বোঝা যায়।’[২৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোমলতার পাশাপাশি কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করে সংশোধন করতেন। তবে তার দেওয়া শাস্তি হতো অন্যরকম। যেমন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) সহ কয়েকজনের সঙ্গে রাসূল (সা.) কথা বলা বন্ধ করে দেন। যা শারীরিক শাস্তির তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ ছিলো।

একজন শিক্ষক বাবার মর্যাদাস্থলে থাকেন, তাই শিক্ষকের জন্যও উচিত তিনি নিজের সন্তানকে যেভাবে ভালোবাসেন, তার শিক্ষার্থীকেও যেন সেভাবেই ভালোবাসেন। হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নিজের ছাত্রদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদের চেহারায় একটি মাছি বসলেও আমি কষ্ট পাই।[২৭]

আলেমরা তাদের ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা সবকিছুর পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. একজন উচ্চ মর্যাদার ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি যখন জ্ঞান অর্জনের জন্য মদীনায় এসেছিলেন তখন অনেক দরিদ্র ছিলেন, ইমাম মালেক রহ. তার এই ছাত্রকে নিজের মেহমান বানিয়ে নেন এবং যতদিন তিনি মদীনায় ছিলেন তার সুবিধা-অসুবিধা সব কিছুর দিকে খেয়াল রাখতেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. উচ্চ শিক্ষার জন্য যখন মদীনা থেকে কুফায় যেতে চাইলেন তখন ইমাম মালেক রহ. তার সফর ও খরচের ব্যবস্থা করে দেন এবং শহর থেকে বের হয়ে এসে তাকে পরম মমতায় বিদায় জানান।

ইমাম শাফেয়ী রহ. কুফায় এসে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ছাত্র হন। এখানে ইমাম মুহাম্মদ তার ছাত্র শাফেয়ী রহ.-এর সব ধরনের খরচ বহন করতেন এবং পূর্ণ সহযোগিতা করতেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. যখন কুফায় এসেছিলেন তখন তার গায়ে একেবারে সাদামাটা একটা কাপড় ছিল, মুহাম্মদ রহ. তাৎক্ষণিক তার জন্য এক হাজার দিরহামের একটি দামি কাপড়ের ব্যবস্থা করেন এবং শাফেয়ী রহ.-কে বিদায় দেওয়ার সময় তার হাতে নিজের জমানো অর্থ থেকে তিন হাজার দিরহাম দিয়েছিলেন।[২৮]

ইসলামের স্বর্ণযুগের এমন অনন্য অসাধারন পাঠদানের দৃষ্টান্তসমূহ, বিরল ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক সত্যিই প্রশংসনীয় এবং অনুসরনীয়।

৩.৩) শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা

ইসলামের প্রথমদিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অনেকটাই অনানুষ্ঠানিক এবং মসজিদ কেন্দ্রিক। আলেমদের কথা শোনার জন্য, তাদের সাথে বই পড়ার জন্য মানুষজন মসজিদে জড়ো হতো এবং এভাবেই জ্ঞান অর্জন করতো। ইসলামের বেশ কিছু বিখ্যাত আলেম এভাবেই ইসলামকে জেনেছেন এবং তাঁদের ছাত্রদের শিখিয়েছেন। ইসলামের চার মাজহাবের ইমামগণ – আবু হানিফা, মালিক, শাফি'ই, এবং আহমাদ বিন হাম্বল আলেমদের সাথে বিভিন্ন আসরে বসে তাঁদের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে (বিশেষত মসজিদে) তাঁদের অসামান্য ইসলামি জ্ঞান অর্জন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মসজিদগুলোতে জায়গা সংকুলান না হয়ায় ছোটো ছোটো জ্ঞানদান কেন্দ্র গড়ে উঠে। অনেক আলেম নিজ গৃহকেই জ্ঞান দানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। সে সকল কেন্দ্রের শিক্ষকদের বলা হতো মুয়াল্লাম বা মুয়াদ্দেব। খলিফাদের যুগে তারা তাদের সন্তানদের জ্ঞান অর্জনের জন্য মুয়াল্লেম নির্ধারন করে দিতেন। তাদের সার্বক্ষানিক পরিচর্চায় ভবিষ্যতের খালিফারা বেড়ে উঠত।

দশম শতাব্দী থেকেই শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করতো যা "মক্তব" নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত মক্তবগুলো মসজিদের সাথে যুক্ত ছিল যেখানে আবাসিক আলেম ও ইমামগণ শিশুদের শিক্ষা দিতেন। মসজিদভিত্তিক শিক্ষালয়গুলোতে কোরআন হাদিস ফিকহ পড়ানো হলেও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামি বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থা মূলত তিন ধাপে ছিল। প্রথম ধাপে শিক্ষার্থীদের কোরআন, হাদিস, গণিত, ভাষা ইত্যাদি শেখানো হতো। দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোনো বিষয়ের ওপর উস্তাদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করতো। তৃতীয় ধাপে গবেষণা শুরু করত।

কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে জ্ঞান চর্চা হতো। খিলাফাতের যুগে বড় বড় মসজিদগুলোতে পাঠাগার থাকত যাতে দর্শন, ইতিহাস, জ্যামিতি, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়েরই পুস্তক সংরক্ষিত থাকত। আব্বাসী খলিফা আল

মামুন ৮৩০ সালে 'বাইতুল হিকমা' নামে একটা শিক্ষালয় স্থাপন করেন যেখানে একাধারে গবেষণা এবং অনুবাদকার্য সম্পাদন করা হতো।[২৯]

৪) ইসলামী শিক্ষার আলোকে শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান অবস্থা উত্তরণের উপায়

এই অভিসন্দর্ভের অবশিষ্ট তথা শেষ অংশে আমি ইসলামের আলোকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থার কিভাবে উন্নতি ঘটানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করব।

৪.১) শিক্ষা দর্শন

ইসলামী শিক্ষার মূল দর্শন হল আখেরাতের অনন্ত জীবনে ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেসব জ্ঞান দরকার, সেগুলো অর্জন করা। পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনে হালাল ও সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে উপকারী জ্ঞান অর্জন করা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার দর্শনের মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি অনুপস্থিত। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী শিক্ষার দর্শনে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার দর্শনের চাইতে কোন কম নেই, বরং বেশি আছে। তবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় যেমন যেকোন মূল্যে দুনিয়ার উপকার তালাশ করা হয়, ইসলামী শিক্ষা দর্শনে সেরকম করা হয় না, বরং ইসলামী সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে জীবিকা তালাশ করা হয়। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই শিক্ষার দর্শন হিসাবে ইসলামের এই ধারণাটি আয়ত্ব করতে হবে।

৪.২) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন

ইসলামী শিক্ষা দর্শনকে গ্রহণ করার পরবর্তী যে কাজটি করণীয়, তা হচ্ছে একটি আখেরাতমুখী, যুগোপযোগী ও টেকসই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা। শিক্ষাক্রমের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় নির্ধারণ করতে হয়, যেমনঃ শিক্ষাব্যবস্থার ধাপসমূহ, পাঠদানের

বিষয়বস্তু, পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষা-বহির্ভূত বিষয়াদি ইত্যাদি। এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

(১) সকল ক্ষেত্রে আখেরাতের জ্ঞানকে দুনিয়াবি জ্ঞানের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন, যে ধরণের প্রতিষ্ঠান ও বিভাগই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

(২) দুনিয়াবি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিষয় (যেমন ব্যাকরণের খুঁটিনাটি জ্ঞান) বাদ দিয়ে জরুরী বিষয়ে (যেমন, ডাক্তারি বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা ইত্যাদি) বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) দুনিয়াবি বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য অনৈসলামি কোন বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না।

(৪) পাঠ্যবই নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামবিরোধী লেখকদের বই অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

(৫) শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধূলা ও শরীরচর্চা, প্রকৃতির সাথে মেলামেশার সুযোগ থাকতে হবে যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে মজবুত হয় ও আল্লাহতাআলার সৃষ্টির সাথে পরিচিত হয়ে স্রষ্টাকে চিনতে পারে।

(৬) শিক্ষা-বহির্ভূত বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেন অনুপ্রবেশ করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৭) শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সক্ষমতার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তথা শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত বাজেটের কথাও মাথায় রাখতে হবে। বাস্তবতা-বিবর্জিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা যাবে না।

আমাদের সমাজের একটি বড় সমস্যা হল এখানে ছাত্রদের জ্ঞান বিজ্ঞান শেখার কেন্দ্র আর ধর্মীয় মুল্যবোধ শেখার কেন্দ্র ভিন্ন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রকে স্কুল কলেজে আর ধর্মীয় মুল্যবোধ যা একজন ছাত্রকে নীতিবান মানুষ হতে শেখায় তা শিখতে গমন করতে হয় মসজিদ-মক্তবে। অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জন দেয় ছাত্রসমাজ। ফলে জাতি একটি শিক্ষিত ছাত্রসমাজ পেলেও বিবেকবান ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পায় না, যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে এমন অনেক আলেম ছিলেন যারা ধর্মীয় জ্ঞান এ তো পারদর্শী ছিলেনই, সেই সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতেও ছিল তাদের সাফল্যমণ্ডিত পদযাত্রা। যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল-কিন্দি (৮০১-৮৭৩) ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত আরব পণ্ডিত, পদার্থবিদ জাফর আস-সাদিক অষ্টম শতাব্দীর একজন মুসলিম পণ্ডিত ও মনীষী ছিলেন, আল ফারাবী (৮৭২-৯৫০) একজন প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।[৩০]

৪.৩) শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষাক্রম হচ্ছে একটি তাত্ত্বিক ধারণা, আর যারা এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দেবেন তারা হচ্ছেন শিক্ষক। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষাক্রম যতই ভাল হোক না কেন, তাতে কোন ফল পাওয়া যাবে না। তাই শিক্ষকদেরকে, বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের শিক্ষকদেরকে হাতেকলমে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবেঃ

(১) শিক্ষকদের মধ্যে আল্লাহভীরুতা জাগ্রত করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। কারণ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপকৃত হতে হলে যাঁরা এই জ্ঞান বিতরণ করবেন, তাঁদেরকে ইসলামের সুমহান শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

(২) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষকতা পেশার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে। তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করতে হবে যে শিক্ষকতা হচ্ছে এক মহান কাজ যা সকল নবী-রাসূলগণ করে গেছেন।

(৩) শিক্ষকদের মধ্যে কোন দক্ষতার কমতি থাকলে তাঁরা নতুন শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। তাই প্রশিক্ষণের সময় এধরণের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধান করতে হবে।

(৪) প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক বাছাই করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন।

(৫) একজন উত্তম শিক্ষক তার সুন্দর আখলাকের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেন। তাই শিক্ষকের বেশভূষা, আচার-আচরন, যোগাযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উত্তম আখলাকের প্রকাশ পেতে হবে।

(৬) শিক্ষকের কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকতে হবে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের এমন কিছু আদেশ করবেন না যা তিনি নিজে পালনে অক্ষম। এভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে।

(৭) পাঠদানের সময় শিক্ষকের ভাষা হতে হবে সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল যাতে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর তা বোধগম্য হয়।

(৮) শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক বেতন ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তিনি হীনমন্যতায় না ভোগেন এবং তার নিজ পরিবার পরিজনদের প্রতিপালন নিয়ে তাকে কারও দ্বারগ্রস্ত হতে না হয়।

(৯) ক্ষমতার লোভে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ থেকে শিক্ষকদের বিরত রাখতে হবে কেননা এর কারনে শিক্ষক জাতির প্রতি সমাজ শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। একটি জাতির মেরুদণ্ড হলো শিক্ষা আর সেই মেরুদন্ডকে সোজা রাখার দায়িত্বে যারা আছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারালে ছাত্র সমাজ কখনই জ্ঞানের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করতে পারবেনা।

(১০) আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষককে ধর্মীয় মূল্যবোধে সঠিক জ্ঞানে দীক্ষিত হতে হবে। তবেই তিনি তার ছাত্রদের জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষার পাশাপাশি ও নৈতিকতায় উজ্জীবিত করতে পারবেন।

৪.৪) জনমত গঠন

একটি শিক্ষাব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে হলে দেশের আপামর জনসাধারণের সমর্থন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সম্প্রতি বাংলাদেশে একাধিকবার দেখেছি যে শিক্ষাব্যবস্থার কিছু আমূল পরিবর্তন দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ ভালভাবে মেনে নেয়নি। যদিও সেই পরিবর্তনগুলো নেতিবাচক ছিল, তবুও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে যে, শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরণের পরিবর্তন আনতে চাইলে দেশের সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে তা করতে গেলে কঠিন হয়ে পড়তে পারে। তাই ইসলামী দর্শনের আলোকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে হলে দেশের জনসাধারণকে এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে জানাতে হবে। মসজিদে জুমুআর খুতবা, ওয়াজ-মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত রূপ ও তার উপকার সম্পর্কে প্রচার করে এই কাজ আঞ্জাম দেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বই-পুস্তক ছাপিয়ে প্রচার করা ও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।

৪.৫) মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি একই পথের পথিক না হয়, তাহলে শুধুমাত্র উন্নত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী দর্শনের আলোকে সাজাতে হলে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য একদল আল্লাহভীরু ও যোগ্য লোক তৈরি করতে হবে, যারা ইসলামী শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণাংগরূপে অনুধাবন করবেন ও তদনুযায়ী এই নীতিগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাস্তবায়ন করবেন।

৪.৬) শিক্ষাব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ও হালনাগাদকরণ

একটি ভাল শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল, এটি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করার সুযোগ থাকতে হবে। তার মূলনীতিগুলো পরিবর্তন হবে না, তবে যুগের ও সমাজের প্রয়োজনে তার প্রায়োগিক বিষয়াদি পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হতে পারে। উদাহরণসরূপ, যদি প্রচলিত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যুগ ও সমাজের প্রয়োজনে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে তা সময়মত করতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নেতৃত্বে ও আল্লাহভীরু শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি থাকতে হবে যাঁরা নির্দিষ্ট সময় পরপর শিক্ষাব্যবস্থা হালনাগাদ করবেন।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করলে ইনশাআল্লাহ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে, যার ফলাফল দেখা যাবে ছাত্রসমাজের উপর।

৫) উপসংহার

এই অভিসন্দর্ভে আমি প্রথমত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরেছি। এরপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার শিক্ষার পরিবেশ কেমন ছিল তা ব্যাখ্যা করেছি। পরিশেষে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে ইসলামী শিক্ষাদর্শন থেকে উপকৃত হতে পারে তার জন্য কিছু পদক্ষেপের কথা বর্ণনা করেছি।

একটি সুন্দর সমাজ তথা জাতি পেতে হলে একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলার দেয়া জীবনবিধান ইসলামই দিতে পারে সেই উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার সন্ধান। তাই যদি আমরা ছাত্রসমাজ, শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষাঙ্গনের কল্যাণ চাই, তাহলে আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই ফিরে যেতে হবে। এর অন্য কোন বিকল্প সমাধান নেই। পরিশেষে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর, তাঁর আহলে বাইতের উপর, তাঁর সমস্ত সাহাবিগণের উপর ও কেয়ামত পর্যন্ত তাঁকে যাঁরা সঠিকভাবে অনুসরণ করবে তাঁদের সকলের উপর।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

[১] সঞ্চিতা, কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯২৫ ইং

[২] www.prothomalo.com, ২৫-৮-২০১৩, মা-বাবাকে একাই খুন করেছে ঐশী?

[৩] www.prothomalo.com, ২৭-৫-২০২১, ঢাবি ছাত্র হাফিজুরের মৃত্যু তদন্ত করতে গিয়ে পাওয়া গেল এলএসডি মাদক

[৪] www.jugantor.com, ১৭-১০-২০২৩, শেরপুরে প্রেমে বাধা দেওয়ায় মেয়ের হাতে মা খুন

[৫] www.dw.com ১৬-১-২০১৭ঃ বাংলাদেশে পর্ণগ্রাফিতে আসক্ত যারা

[৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age

[৭] মুসতাদরাক হাকেম, ৩/২৩

[৮] তাজকেরাতুস সামে ওয়াল মুতাকাল্লিম, ৭৮

[৯] হাওয়ালা সাবেক, ৮৮

[১০] সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৯

[১১] সহিহ মুসলিম

[১২] সহিহ বোখারি, ৭০৮০

[১৩] সহিহ বোখারি, ১৭৪১

[১৪] সহিহ মুসলিম, ৪৩

[১৫] মুসনাদে আহমদ, ৮০৭১

[১৬] -সহিহ বোখারি : ৭৩৭৩।

[১৭] -সহিহ বোখারি : ৪৪৭৪।

[১৮] -মুসনাদে আহমদ : ৮০৯৫।

[১৯] -সহিহ বোখারি : ৬০০৫–

[২০]   সহিহ মুসলিম : ১২

[২১]   - -সুনানে বায়হাকি : ৩৬৭২।– -

[২২] -মুসনাদে আহমদ : ২২২১১

[২৩] -সহিহ বোখারি : ৬৪১৭

[২৪] সহিহ বোখারি : ৫০৩৩

[২৫] সহিহ বোখারি ও মুসলিম

[২৬] -শামায়েলে তিরমিজি : ২২২

[২৭] (তাজকিরাতুস সামে, ৯)-

[২৮] (জামিয়ু বয়ানুল ইলম লি ইবনু আব্দিল বির, ২/৮)

[২৯] Medieval Islam, Sourdel, 1986

[৩০]
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_in_medieval_Islamic_world

---

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111372579/